বিবর্তনের দৃষ্টিতে জীবন

- অপার্থিব(aparthib@yahoo.com)

বিবর্তনের আলোচনা ও বিতর্কের অনেকটাই ব্যয়িত হয় বিবর্তন আদৌ ঘটেছে কিনা তাই নিয়ে। বিবর্তনের পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ দিতে ও সৃষ্টিবাদীদের যুক্তি খন্ডন করতে অনেক সময়ই ব্যয় করেন বিবর্তন এর সমর্থকরা। কিন্তু অনেক বিবর্তন সমর্থকরাও বিবর্তনের প্রকৃত অর্থ ও তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। এই প্রবন্ধে আমি তার উপরেই আলোকপাত করতে চাই। যদিও বিবর্তন এর ঘটনা এবং এর মূল কারণটি (অর্থাৎ পরিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্বাচন, Mutation and Natural Selection) এখন তর্কাতীত, এর খুঁটিনাটী এবং কি উপায়ে এটা ঘটে এর বিশদ ব্যাখ্যা (অর্থাৎ বিবর্তনের তত্ত্ব) নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। অবশ্য সেই তর্ক বিজ্ঞানভিত্তিক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমিত, কারণ তা বিজ্ঞানেরই একটা গবেষণার বিষয়। এই প্রবন্ধটি বিবর্তন ঘটার মৌলিক সত্যকে মেনে নিয়ে মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে এর গভীর অর্থ ও তাৎপর্য কি তা নিয়েই লেখা।

বিবর্তনের এই মৌলিক সত্যটির প্রকৃত অনুধাবন জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভংগীর উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। জীবনের অর্থ বা উদ্দেশ্য কি, কেন জীবনটা এমন ইত্যাদি প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখায়। বিশেষ করে প্রেম, অনুভূতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক আচারসমূহ এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের স্বভাব নিয়ে তা আমাদের নতুন ভাবে বিচার করতে শেখাচ্ছে। মনোজীববিজ্ঞানের (psychobiology) এক নতুন শাখা বৈবর্তনিক মনোবিজ্ঞান (Evolutionary Psychology) এই বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়। এই শাখা বির্বতনের মাধ্যমে মানুষের স্বভাব ও আচরণ অর্থাৎ অনুভুতি, আবেগ, কর্মকান্ড ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে।

বিবর্তনের মূল কথা হল মানুষ সহ প্রাণের সকল সমকালীন রূপই এক আদিপ্রাণরূপের (Primitive Life Form) কোটি কোটি বছরের ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত। এই ক্রমবিবর্তন সম্পূর্ণরূপে এক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। আর এই আদিপ্রাণরূপ পৃথিবীর প্রাক্‌জৈবিক আবহাওয়ায় জটিল অণুর রাসায়নিক ক্র-মবিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত। জটিল অণুগুলি আবার সরল অণু ও পরমাণু থেকে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী সৃষ্ট। যে যদিও পূর্বে উল্লেখ করেছি যে বিবর্তনের মৌলিক প্রক্রিয়া হল পরিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্বাচন, যার আসন্ন উদ্দেশ্য হল প্রাণীর বংশাণুর উদ্বর্তন ও সন্ততি রক্ষা করা(Survival and propagation of genes), আর বংশাণুর উদ্বর্তন ও সন্ততি রক্ষার ফলশ্রুতি হল মানুষ তথা জীবের সেই সব প্রলক্ষনই (Trait) এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় যেগুলি তার নিজের উদ্বর্তনের জন্য সহায়ক। কিন্তু পরিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মৌলিক কারণ হল পদার্থবিজ্ঞানের বিধিসমূহ। তাই এটা বলাই ঠিক হবে যে প্রাণ সৃষ্টির তথা বিবর্তনের মূলে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের বিধিসমূহ। যুক্তি ও প্রমাণ আমদেরকে এই সত্যটা মেনে নিতে বাধ্য করে। এটা অস্বীকার করার মানে হল জীবজন্তুর (বিশেষ করে মানুষ) পেছনে অদৃশ্য এক প্রাণশক্তির (Vital Force) অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রাণশক্তিতে বিশ্বাস করবার লোভ সংবরন করা সাধারণ মানুষের জন্যে দুরূহ , কারণ মানুষের মন বা চেতনাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বা বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা বা ব্যাখ্যাকে সহজে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর। তাই অধিকাংশ মানুষই 'আত্মা' নামক এক অদৃশ্য প্রাণশক্তিতে বিশ্বাসী। এতে চট্ করে রহস্যের সমাধান হয়ে যায় (বা সমাধানের অধ্যাস বা কল্পনাভ্রম সৃষ্টি হয়)। এমনকি মুক্তচিন্তার দাবীদার অনেক বিবর্তন সমর্থকদের কিছু আবেগময় বাক্যেও আত্মায় তাঁদের অবচেতন বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়, যেমন স্বাধীন ইচ্ছার উপর জোর

দেয়া, মানুষ যে যন্ত্র নয় এই কথাটা জোর দিয়ে বলা ইত্যাদি। অনেকে এই যুক্তিও দেন যে নৈতিকতা কখনও বিজ্ঞানের আওতায় পড়েনা বা বিজ্ঞানের দ্বারা নির্ধারণ করা যায়না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই উক্তিটি সত্য হলে জ্ঞানের যে কোন শাখার ক্ষেত্রেও এটা প্রজোয্য। কাজেই এটা কোন আপ্তবাক্য নয়। বরং বিবর্তনের আলোকে এটা বলা যায় যে মানুষ (ও তার মস্তিষ্ক) যেহেতু পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে সৃষ্ট (বিবর্তনের মাধ্যমে) এবং নৈতিকতা বা মূল্যবোধ যেহেতু মানুষের মস্তিষ্কেই সৃষ্ট ও নিহিত, সেহেতু এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে নৈতিকতা বা মূল্যবোধও (পদার্থ)বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা সৃষ্ট। একই যুক্তিতে আরও সাধারণভাবে বলা যায় যে মানবজীবনের সব দিকই, যেমন চেতনা, প্রেম, রাগ, ঈষা, র্অনুভুতি, ইত্যাদি সবই পদার্থবিজ্ঞানের আবশ্যকীয় পরিণতি হিসেবে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট। এটা অস্বীকার করা মানেই অসংজ্ঞিত এক 'আত্মা' বা 'প্রাণশক্তির' ধারণাকে স্বীকৃতি দেয়া। তবে মানব জীবনের এই সব দিকগুলির ব্যাখ্যা করার জন্য সরাসরি পদার্থবিজ্ঞানের সরণাপন্ন হতে হয় না। বৈবর্তনিক মনোবিজ্ঞান বংশাণুর উদ্বর্তনের দ্বারাই মূলত এর ব্যাখ্যা দেয়। জীববিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্লার্ক তাঁর ''Are we hardwired?'' (আমাদের আচরণ কি পূর্বনির্ধারিত?)নামক বইয়ের ১০ পৃঃ লিখেছেনঃ ''চূড়ান্ত বিচারে সকল জীবের অস্তিত্বের সকল দিকই নিয়ন্ত্রিত হয় বংশাণুর দ্বারা, মানুষ এর কোন ব্যতিক্রম নয়।''

প্রাণ সৃষ্টির আদিকারণ হিসেবে পদার্থবিজ্ঞানকে সনাক্ত করায় কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন রসায়ন বা জীববিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কেবল পদার্থবিজ্ঞানকে কেন বেছে নেওয়া? মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী অনেকেও এই মত পোষণ করেন যে জীববিজ্ঞানের ঘটনাগুলো পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের আওতায় পড়ে না। এটা প্রকারান্তরে জীব বা প্রাণের সৃষ্টীকে একটা অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলে চালাবারই সামিল। কারণ প্রাকৃতিক ঘটনা বলতে আমরা বুঝি যা কিছুই প্রকৃতির নিয়মে অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে ঘটে। অতিপ্রাকৃত বলতে সেই ঘটনাকেই বোঝান হয় যা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং তা লংঘন করে। পৃথিবীর সবকিছুই, তা জীব বা অজৈব পদার্থ ই হোক, মৌলিক পদার্থকণার (লেপ্টন বা হাল্কা কণা ও কোয়ার্ক) সমষ্টি। যেহেতু পদার্থের এই মৌলিক উপাদান সমূহ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলে, সেহেতু বলাই বাহুল্য যে জড় ও জীব সব কিছুই, যা কিনা এই মৌলিক কণার দ্বারা গঠিত, তাও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মেই চলবে। এখন পর্যন্ত জড় ও জীবের মধ্যে এমন কোন ধর্ম বা ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি যা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে লংঘন করে। জীবিত বা মৃত কোন প্রাণীর মধ্যেই এই জানা মৌলিক পদার্থকণা ছাড়া অন্য কোন উপাদান পাওয়া যায়নি।

জীবিত ও মৃত প্রাণীর পার্থক্য না বোঝার কারণে সাধারণ মানুষ আত্মার ধারণা উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু পার্থক্যটা মূলত ভৌত, জীবিত প্রাণী তাপগতীয় ভারসাম্যহীন অবস্থায় (non-equlibrium Thermodynamic State) থাকে, আর মৃত প্রাণী সম্পূর্ণ তাপগতীয় সাম্যাবস্থায় (Thermodynamic Eqilibrium State) বিরাজ করে। আরও অনেক ভৌত পার্থক্য আছে কিন্তু তা অণুজীববিজ্ঞানের বিষয়।

মানুষ কেবল পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে সৃষ্ট নয়, এর পেছনে অন্য কোন কারণও আছে, এটা বলার মানে হল ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত সেই পুরান প্রাণশক্তিবাদ (Vitalism) কে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াষ। তবে এটাও বলা হচ্ছে না যে পদার্থবিজ্ঞানের সব কিছুই জানা হয়ে গেছে, অজানা কিছুই নেই। পদার্থবিজ্ঞানের দিগন্ত ক্রমপ্রসারমাণ। এই লেখায় পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম বলতে আমি জানা এবং অজানা দুটোই বোঝাব। কারণ আজকের অজানা আগামীকালের জানা।

পদার্থবিজ্ঞানকে মূল কারণ বলাতে কেউ কেউ এটাকে আমার ব্যক্তিগত মত হিসেবে নাকচ করতে পারেন। সেই কারণে এবং যেহেতু এই প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই উপলব্ধিটি সেই কারণে আমি এটা নিয়ে আরও কিছু সময় ব্যয় করব কিছু নামকরা বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি

দিয়ে। যারা এটা নাকচ করেন তারা অবশ্যই বিজ্ঞানী নন। রিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি দেয়ার আগে একটা সহজ সত্যের উল্লেখ করা যাক। উচুমানের কোন জীববিজ্ঞানের বই খুললেই প্রথমেই পাওয়া যাবে রসায়নের কিছু প্রাথমিক পরিচিতি। আবার রসায়নের বই খুললে প্রথমেই পাওয়া যাবে পদার্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক পরিচিতি। এতেই খানিকটা ইংগিত পাওয়া গেল।এখন কিছু বিজ্ঞানীদের এ ব্যাপারে কি মত সেটা জানা যাক। কেমব্রিজ বিশবিদ্যালয়ের ট্যানার সিরিজের তিনটি লেকচারে স্টিফেন হকিং শ্রোতাদের এটা স্মরণ করিয়ে দেন যে রসায়ন হল পদার্থবিজ্ঞানের লব্ধ ফল, আর জীববিজ্ঞান হল রসায়নের লব্ধ ফল, আর তাই মানুষের মন বা মস্তিষ্ক পদার্থবিজ্ঞানেরই পরিণতি। (এটার উল্লেখ পাওয়া যাবে "The Large, the Small and the Human Mind" নামক বইটিতে)। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ওয়াটসন ১৯৮৫ সালে লন্ডনের সমকালীন শিল্পকলা ইনস্টিটিউটে এক বক্তৃতায় বলেন যে 'শেষ বিশ্লেষণে আছে শুধু পরমাণু, আর একটাই বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, অন্য সবকিছুই সামাজিক সৃষ্টি। আরেক নোবেল বিজ্ঞানী ওয়াইনবার্গ বলেন যে ''বর্তমানে কোন জীববিজ্ঞানী-ই এটা আর মানবেননা যে জীববৈজ্ঞানিক আচরণের আরও মৌলিক স্তরের কোন ভিত্তি নেই। আর এই মৌলিক স্তরটি অবশ্যই পদার্থ এবং রসায়ন বিজ্ঞান । এর সাথে যুক্ত করতে হবে পৃথিবীর কোটি কোটি বছরের ইতিহাসের আপতিক ঘটনাসমূহ(Contingencies)।'' এই উক্তিটির উল্লেখ পাওয়া যাবে ওয়াইনবার্গ এর ''Facing Up" নামক বইটির ২২-২৩ পৃষ্ঠায়। প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিনস্ তাঁর ''অন্ধ ঘড়িনির্মাতা (The Biind Watchmaker) বইটিতে পাঠকদের একথাই স্মরণ করিয়ে দেন যে, যদিও বিবর্তনের ব্যাখ্যা পরিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা সম্ভব, কিন্তু বিবর্তনের একেবারে গোড়ার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপে যেতে হলে আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের দ্বারস্থ হতে হবে। আণবিক জীববিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্কলিন হ্যারল্ড তাঁর ''The Way of the Cell" বইয়ের পৃ-৪ এ লিখেছেনঃ ''আমাদের এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ঠ কারণ আছে যে সব জীববৈজ্ঞানিক ঘটনারই, তা সে যত জটিলই হোক না কেন, চুড়ান্ত ভিত্তি হল অণুদের মধ্যকার রাসায়নিক ও ভৌত মিথষ্ক্রিয়া।'' একই বইয়ের উপসংহারে তিনি বলেন যে ''এই বই লেখা হয়েছে এই স্বতঃবাক্যকে আশ্রয় করে যে জীবন একটি জড়প্রপঞ্চ (Material Phenomena) যা রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে''। প্রয়াত পদার্থবিজ্ঞানী হাইনয্ পেগেলস্ (Heinz Pagels) তাঁর ''যুক্তির স্বপ্ন (Dreams of Reason)'' বইয়ের ৪৯ পৃঃ এ লিখেছেন ''জীববৈজ্ঞানিক তন্ত্রগুলি এক বিশেষ অতিজটিল কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল তন্ত্র যা সুসংজ্ঞিত সূত্র মেনে চলে।'' প্রাণীবিদ্ ও পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞান লেখক কলিন টাজ লন্ডনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার ২৫শে জানুয়ারী ১৯৯৮ সংখ্যার এক নিবন্ধে লিখেছিলেন যে ''পদার্থবিজ্ঞানের তলাকার সূত্র ছাড়া জীববৈজ্ঞানিক সূত্র বলে কিছু নেই।'' মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফ্রেড অ্যাডাম্স্ তাঁর ''Origin of Our Existence: How Life Emerged in our Universe'' (আমাদের অস্তিত্বের উৎসঃ কেমন করে মহাবিশ্বে প্রাণের উদ্ভব ঘটল) বইয়ে লিখেছেনঃ

পৃঃ ১৯১:

''সেই একই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মই প্রাণ বিকাশের প্রথম প্ররোচণার যোগান দেয় যার পরিণতিতে জটিল প্রাণী যেমন মানুষের সৃষ্টি হয়।''

পৃঃ ১৯৩:

''যে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম দিয়ে গ্রহ নক্ষত্রের গতি সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করা যায় সেই একই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মই সকল জীবিবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রন করে''

ওই বইয়েরই শেষ প্রচ্ছদে মন্তব্য রেখেছেন বিজ্ঞানী ও নিউ ইয়র্কের হেডেন প্লানেটারিয়ামের পরিচালক নীল ডী গ্রাস এই বলেঃ

''জীববিজ্ঞানের নতুন দিগন্তের কথা আজকাল অহরহ শোনা যাছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মই যে প্রাণের সৃষ্টি ও বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে তা আমাদের মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয়াকে আমি স্বাগত জানাই''

পরিশেষে জীবিবিজ্ঞানী আর্নস্ট্ মেয়ার (Ernst Mayer) এর একটা উক্তি দিয়ে এই বিষয়টি শেষ করিঃ ''সব জীববিজ্ঞানীই এ ব্যাপারে অবহিত আছেন যে আণবিক জীববিজ্ঞান নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে জীবের সকল প্রক্রিয়াই রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব''
দ্রঃ "The Growth of Biological Thought (1981)'' (এর উল্লেখ পাওয়া যাবে ওয়াইনবার্গ এর ''Facing Up" বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায়)

এটা পরিস্কার বলে দেয়া দরকার প্রাণের সৃষ্টি বা জীবনের সব কিছুই যে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে গেছে তা নয়। কিন্তু সেজন্য প্রাণ সৃষ্টির আদিকারণ যে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝান যাক। মাধ্যাকর্ষণের সূত্রের দ্বারা মহাকাশে পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষনে আবদ্ধ দুটো বস্তুর (যেমন একটা তারা ও তার গ্রহ, বা একটা গ্রহ ও তার উপগ্রহ) কক্ষপথ যে উপবৃত্তাকার হবে সেটা আমরা নির্ভুলভাবে সমীকরণ দ্বারা নিরূপন করতে পারি। কিন্তু দুটোর যায়গায় যদি তিনটি বস্তু পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষনে আবদ্ধ হয় তাহলে মাধ্যাকর্ষণের সূত্রের দ্বারা ঐ তিনটি বস্তুর কোনটারই কক্ষপথ নির্ভুলভাবে গাণিতিক সমীকরণ দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এটা মাধ্যাকর্ষণের সূত্রের কোন সীমাবদ্ধতার কারণে নয়, বরং আমাদের গণনার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার জন্য, যে সীমাবদ্ধতার জন্য কোন অসরলরৈখিক (Non-linear) সূত্রের (যেমন মাধ্যাকর্ষণের সূত্র) গাণিতিক কোন সমাধান সম্ভব নয় । তাই বলে আমরা কি এটা বলব যে ঐ তিন গ্রহ-তারা সমষ্টির কক্ষপথের পরিলক্ষিত আকৃতি মাধ্যাকর্ষণের সূত্রের দ্বারা নির্ধারিত নয়?। অন্য কোন অজানা শক্তি বা বলের দ্বারা নির্ধারিত?। অবশ্যই নয়। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কক্ষপথের পর্যবেক্ষিত আকৃতি মাধ্যাকর্ষণের সূত্রকে আবার লংঘনও করেনা। এর থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে সব ঘটনাই বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও কোন কোন ঘটনা সরাসরিভাবে এবং পুংখানুপুংখভাবে বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা আহৃত করা যায়না। এরকম ঘটনার আরও একটি উদাহরণ হল আবহাওয়া। আর চূড়ান্ত উদাহরণ হল মানুষ। এটা এখন পরিস্কার যে তিনটি খ-বস্তুর পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণ জনিত কক্ষপথই যদি বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করা যায়না সেখানে কোটি কোটি অণু পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত মানুষকে বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা পুংখানুপুংখভাবে বর্ণনা করা কি করে সম্ভব?। মানুষের বেলায় ব্যাপারটা আরও জটিল, কারণ শুধু মাধ্যাকর্ষণের সূত্রই নয়, Electro-Weak ও Strong এই দুই অসরলরৈখিক বলের সূত্রও কাজ করে মানুষের দেহের অণু পরমাণূতে। কিন্তু আবহাওয়ার মতই গড়ভাবে মানুষের স্বভাব আচরণকে ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব যেটা দেয় বৈবর্তনিক মনোবিজ্ঞান। বৈবর্তনিক জীববিজ্ঞান মুলত বংশাণুর উদ্বর্তন ও সন্ততি রক্ষার নীতির উপর নির্ভর করেই এই সবকিছুকে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে। যাহোক জড় পদার্থ ও জীবের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। আমরা যে পার্থক্যটা দেখতে পাই তা জীবের আভ্যন্তরীণ অসংখ্য অণুপরমাণুর বিন্যাসের পার্থক্যের কারণে, বিজ্ঞানের নিয়মের কোন পার্থক্যের জন্য বা অন্য কোন নিয়মের কারণে নয়। মানুষের অনুভুতি বা মস্তিষ্কের যে কোন কর্মই বস্তুর বিকাশমান ধর্মের (Emergent Property) দরুন। বিকাশমান ধর্মের মূল কারণ হল বিজ্ঞানের সূত্রগুলির অসরলরৈখিকতা ও মিথষ্ক্রিয়াযুক্ত বহু সংখ্যক কণার সমষ্টি। অবশ্য এর সঙ্গে আরও অনেক অনুকুল বাহ্যিক শর্তেরও শুভ সঙ্গম প্রয়োজন। একট সুন্দর তুষারের স্ফটিক আর একটা এবড়ো খেবড়ো পাথরের টুকরো উভয়ই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে সৃষ্ট। কিন্তু বিকাশমান ধর্ম ও বাহ্যিক শর্তের পার্থক্যের কারণে একটির মধ্যে আমরা সুন্দর এক প্রতিসাম্য ও কারুকার্য্য দেখতে পাই যা অন্যটায় অনুপস্থিত। বাহ্যিক শর্ত অল্প সময়ে এক কিস্তিতে পূরণ হতে পারে আবার ছোট ছোট কিস্তিতে অনেক সময়ে বিস্তৃত হতে পারে।

মানুষ সৃষ্টির বাহ্যিক শর্তপূরণ হল বিবর্তনের দ্বারা কোটি কোটি বছরের পুঞ্জীকৃত এক ঘটনা। এখানে ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিকাশমান ধর্ম নতুন এক বিজ্ঞানের শাখা যা জটিলতা বিজ্ঞান (Science of Complexity) নামে পরিচিত তার গবেষণার বিষয়। অতীতে যখন জটিলতার ঘটনা জানা ছিলনা তখন আনেকে লঘূকরণবাদকে (Reductionism) কে সমালোচনা করে সমষ্টিবাদ (Holism) প্রচার করে এই দাবী করতেন যে পুরোটা কখনই তার ক্ষুদ্রতম উপাদানের মাধ্যমে বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। আধুনিক জটিলতা বিজ্ঞানের আলোকে এই লঘূকরণবাদ বনাম সমষ্টিবাদ বিতর্ক অকেজো ও সেকেলে
হয়ে গেছে। বিজ্ঞানে লঘূকরণবাদ বা সমষ্টিবাদ বলে কোন ধারণা নেই।

উপরের দীর্ঘ ভূমিকার (যার প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি) পর এবার আসা যাক মূল আলোচ্য বিষয়ে, অর্থাৎ বিবর্তনের তাৎপর্য এবং তা থেকে জীবনের ব্যাপারে কি উপলব্ধিতে আসা যায় সেটা নিয়ে। একটা তাৎখনিক উপলব্ধি হল ‘‘আমরা’’ বা ‘‘আমি’’ এই শব্দগুলি এক অলীক ধারণা মাত্র। এই শব্দগুলির দ্বারা সাধারণভাবে মানুষের দেহের বহির্ভূত কোন নিয়ামক শক্তির অস্তিত্বের ইংগিত করা হয় যার কোন ভিত্তি নেই বলে পূর্বেই যুক্তি দেখিয়েছি। সঠিক ভাবে বলতে হলে ‘‘আমি’’র দ্বারা বোঝানো উচিত ‘‘আমি’’ শব্দটির বক্তার মস্তিষ্ককে (আরও নির্ভুলভাবে বলতে হলে মস্তিষ্কের এক বিশেষ অংশের বর্তনীগুলিকে যাকে Synaptic Connections বলা হয় স্নায়ূবিজ্ঞানে) যা বক্তাকে তার সকল কর্ম, উক্তি, আচরণ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ/নির্ধারণ করে। প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্ক বা তার Synaptic Connections পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মেই বিকাশমান ধর্মের মাধ্যমে ও ভিন্ন বাহ্যিক শর্তের কারণে সৃষ্ট। এই বাহ্যিক শর্তগুলি হল সেই বক্তার বংশাণু (Gene) এবং যে বাহ্য পরিবেশে সে বেড়ে উঠতে থাকে, যার সাথে সে সদা মিথষ্ক্রিয়ায় (Mutual Interaction) লিপ্ত । বংশাণু ও পরিবেশ দুটোই মস্তিষ্কের Synaptic Connections কে তার এককত্ব (Uniqueness) আরোপ করে। এক কথায় বলতে হলে একটা মানুষের ব্যক্তিত্ব, তার নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্য, সবই তার মস্তিষ্কের Synaptic Connections এর জন্য। স্নায়ূবিজ্ঞানী Joseph Ledoux তাঁর The Synaptic Self নামক বইতে এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধটিও লেখকের মস্তিষ্কের Synaptic Connections কারণেই লিখিত হচ্ছে। এটা এক কঠিন ঠান্ডা সত্য। এর পেছনে কোন দেহ বহির্ভূত প্রাণশক্তি কাজ করছে না। হ্যাঁ এটা সত্য বটে যে মানুষের বংশাণু যে বংশাণবিক সূত্র (Genetic Code) অনুসরন করে, যা চূড়ান্ত বিচারে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মেরই বহিঃপ্রকাশ, তা দেহবহির্ভূত এক ধারণা, যেমন একটি গানের কথা বা সুর গানের ক্যাসেট, গায়কের কন্ঠ বা বাদ্যযন্ত্রের বহির্ভূত এক অস্তিত্বের ধারণা। কিন্ত এই তিনটির কোনটা ছাড়াই গান বা সুরটির সৃষ্টি বা অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়না। তেমনি এটাও বলা যায় যে বংশাণবিক সূত্রও বংশাণু (দেহের অংশ) ছাড়া অস্তিমান হতে পারে না। দেহ বহির্ভূত কোন প্রাণশক্তির কথা বলতেই যদি হয় তাহলে এই বংশাণবিক সূত্রকেই সেই মর্যাদা দেয়া ঠিক হবে।

উপরের আলোচনা থেকে আরেকটা তাৎপর্য বেরিয়ে আসে, সেটা হল যে ‘‘স্বাধীন ইচ্ছা’’ও একটা অধ্যাস মাত্র। এর কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। কারণ প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ হল মানুষের এমন এক চালনী শক্তি যা দেহের ও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের বহির্ভূত, এবং তা মানুষকে এমন ভাবেও চালাতে সক্ষম হবে যা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের বিরুদ্ধেও যেতে পারে। পাঠককে এটা ‘‘আত্মার’’ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না কি? কাজেই পদার্থবিজ্ঞানের পরিণতিতে সৃষ্ট মানুষের প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছা থাকতে পারেনা। মানুষের সব কর্ম ও চিন্তা চুড়ান্ত বিচারে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটা বাক্য আমরা প্রায়ই শুনতে পাই ‘‘আমরা কি করব না করব তা সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমাদেরই হাতে। আমরা রোবট নই, আমাদের মন আছে, যা আমাদের ভাল মন্দ চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছে’’ ইত্যাদি। বাক্যটির অসারতা এখন প্রতীয়মান হবার কথা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে স্বাধীন ইচ্ছা মস্তিষ্ককের

বর্তনীতে সৃষ্ট একটি অনুভূতি মাত্র। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ওয়েগনার বলেন সচেতন স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস কেবল একটি অধ্যাস মাত্র। এর বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই। তাঁর বই ''Illusion of Conscious Will'' এর মূল আলোচ্য বিষয় এটাই। আরেকজন বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানী ভিক্টর জনস্টন তাঁর ''Why We Feel: The Science of Emotion'' এর ১৮৮পৃঃ এ বলেন যে স্বাধীন ইচ্ছার সংজ্ঞার অর্থাৎ ''যা চাই সেটা করার ক্ষমতা'' এর ''যা চাই''' অংশটি জীববৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত। কাজেই যখন কেউ বলে যে স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ আমার যখন ইচ্ছা আমার মন পরিবর্তন করতে পারি, আসলে তার সেই 'ইচ্ছা' টাই ''যা চাই'' এর মত জীববৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত। তাই স্বাধীন ইচ্ছার প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই। বংশাণু রক্ষা ও প্রসারণের জন্য বিবর্তন যে সকল ধর্ম মস্তিষ্কে সৃষ্টি করে স্বাধীন ইচ্ছার অনুভুতি তার একটি উদাহরণ, যেমনটি ভয়, ঈর্ষা, প্রেম ইত্যাদি। কোন একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার পর মস্তিষ্কে উক্ত সিদ্ধান্তটি স্বাধীন ইচ্ছাজনিত বলে অনুভূত হয় মাত্র, কিন্তু সিদ্ধান্তটির পশ্চাদে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের বিধি আর চারিপাশের অসংখ্য নির্ধারক উপাদান ও অতীতের তাবৎ ঘটনাসমূহের প্রভাব। কেউ কেউ কোয়ান্টাম তত্বের কথা বলে স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। কারণ কোয়ান্টাম তত্বে সম্ভাব্যতা ও এলোমেলোতার (Randomness) কথা বলা হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্বও পদার্থবিজ্ঞানেরই বিধি এবং এলোমেলোতার জন্য কোন কর্ম বা চিন্তা স্বাধীন হয়ে যায়না, কারণ এলোমেলোতা সত্যিকার অর্থে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যদি মানুষের কর্ম তার ''নিজের'' দ্বারা নির্ধারিত হত তাহলে সেটা কার্য্য-কারণ নিয়মের আওতায় পড়ে যায়, কিন্তু এলোমেলোতার সংজ্ঞাই হল কার্য্য-কারণ বহির্ভুত কোন ঘটনা।

বিবর্তনের আরেকটি তাৎপর্য হল নৈতিকতা বা মূল্যবোধের কোন পরম অর্থ নেই। এটাও বিবর্তনের(পদার্থবিজ্ঞানেরই) নিয়মে মানুষের মস্তিষ্কে সৃষ্ট, মূলত বংশাণু রক্ষণ ও বিস্তারের মৌলিক লক্ষ্যে। আমরা যখন জোর দিয়ে বলি ''এটা উচিত, ওটা অনুচিত'' ইত্যাদি, সেটা পদার্থবিজ্ঞানই আমাদের বলায় মস্তিষ্কের বর্তনীর মাধ্যমে। ভাল ও মন্দের ধারণা বিবর্তনের একট উৎপাদ। এর উৎপাদনের প্রক্রি-য়া হলঃ পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র-->বিবর্তনের সূত্র-->মস্তিষ্কের বর্তনী-->নৈতিকতা। তবে নৈতিকতা একটা পারিসাংখ্যিক ধারণা। একটা গোটা মানবগোষ্ঠির সকল মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ সমান হবেনা। কিন্তু গড় মূল্যবোধ এমন হতে হবে যা মানুষ প্রজাতিকে রক্ষা ও প্রসারে সহায়তা করবে। যখন এটা বলা হয় যে নৈতিকতা বা মূল্যবোধের কোন পরম অর্থ নেই তখন অনেকে এই বলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ঃ ''তবে কি আমরা যা খুশি তাই করব? জবাবদিহিত্ব না থাকলে কে আমাদের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে?'' ইত্যাদি। তারা এটা বোঝেন না যে যখন বলা হয় যে নৈতিকতা বা মূল্যবোধের কোন পরম অর্থ নেই, তখন এটাই বোঝান হয় যে নৈতিকতা বা মূল্যবোধ মানুয়ের বহির্ভূত কোন প্রাণশক্তি বা দৈব কোন শক্তির দ্বারা আরোপিত নয়, এটা বিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট, বিবর্তনেরই তাগিদে। কাজেই ধর্মে বিশ্বাস থাকুক না থাকুক, এটা কখনই ঘটবেনা যে সব মানুষই নীতিহীন হয়ে যাবে, কারণ তা বিবর্তনের পরিপন্থী, কারণ তা মানুষ প্রজাতির জন্য আত্মঘাতী হবে। বিবর্তনের নিয়মেই তা নিষিদ্ধ। বিবর্তনের কাজই হল প্রজাতির উদ্বর্তন নিশ্চিত করা। মানুষ তার মস্তিষ্কের দ্বারা নৈতকতা নিয়ে যা বলে (গড় অর্থে)তা বিবর্তনের নিয়ন্ত্রের মুখপাত্র হয়েই বলে। নৈতিকতা যেহেতু বিবর্তনজনিত, সেহেতু কিছু কিছু মৌলিক নীতি ছাড়া স্থান ও কাল ভেদে তারও কিছু হেরফের হতে পারে।

উপরোক্ত মন্তব্য মানুষের অন্যান্য সহজাত প্রবৃত্তি যেমন ভয়, উৎকণ্ঠা, রাগ, ঈর্ষা, প্রেম তথা অনুভুতি বা আবেগের বর্ণালীর সকল অংশের ক্ষেত্রেই প্রজোয্য। কিন্তু যুক্তিবাদী চিন্তা? সেটাও কি বিবর্তনের নিয়মে সৃষ্ট? হ্যাঁ, কিন্তু একটু তফাত আছে। মানুষের (কিছু মানুষের বলা ঠিক হবে) কোন কোন প্রবৃত্তি সরাসরিভাবে বিবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরী হয়নি। এগুলো অন্য কোন প্রয়োজনীয় (বিবর্তনের অর্থে) প্রবৃত্তির আবশ্যকীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা উপজাত হিসাবে উদ্ভূত হয়। এগুলোকে বিবর্তনের স্প্যান্ড্রেল (Spandrel) বলা হয়। এগুলি যদিও সরাসরিভাবে বিবর্তনের উদ্দেশ্য সাধন করে না কিন্তু এটা ছাড়া উদ্দেশ্য সাধনকারী প্রবৃত্তিগুলোর সৃষ্টিও সম্ভব নয়। ইমারত নির্মাণের সময় পিলার জোড়া

লাগাবার পর কিছু বাড়তি অংশ বা ফাঁকা জায়গা অবধারিতভাবে তৈরী হয়ে যায় যা পিলারের বা দালানের সাম্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয় কিন্তু এটা এড়ানও সম্ভব নয়। মানুষ প্রজাতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার তাগিদেই বৈবর্তনিকভাবে যুক্তি ও অংকের প্রবৃত্তি সৃষ্ট হয় তার মস্তিষ্কে। বিবর্তনের জন্য যে যুক্তি ও গণিতের প্রয়োজন, আধুনিক মানুষ তার চেয়ে বাড়তি নেক বেশি সৃষ্টি করেছে,Spandrel এর মত অবধারিতভাবেই। যুক্তিবাদ এই উপজাত বা Spandrel. যুক্তিবাদ বলতে আমরা বুঝি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তি ও প্রমাণের প্রাধান্য দেয়া। অনুরূপভাবে সৌন্দর্য্যবোধ ও শিল্পচর্চাও আদিম যুগে বিবর্তন জনিত প্রতিসাম্যবোধ বা প্রতিসাম্যপ্রীতি থেকে উদ্ভূত এক Spandrel. আদিম পরিবেশে পৃথিবীর সমতল ভূমিতে কিছু কিছু প্রতিসম জ্যামিতিক আকৃতির প্রতি আকর্ষণ মানুষকে এক উদ্বর্তনী মূল্য(Survival Value) প্রদান করেছিল। সৌন্দর্য্যবোধের সৃষ্টির মূলেই ছিল এটি । বিবর্তনের হাওয়া এই Spandrel গুলিকেও ছুঁয়ে যায়। তাই সময়ের সাথে এটাও ক্রমশঃ জতিল ও উন্নততর হতে থাকে। তাই আমরা পাই রবীন্দ্রনাথ বা মোত্জার্ট এর সুকুমার কলা বা স্ট্রিংগ তত্বের (string Theory) মত সূক্ষ্ম ও জটিল এক সৃষ্টি। আগেই বলেছি ভয়, উৎকণ্ঠা, রাগ ইত্যাদি বিবর্তনের প্রত্যক্ষ্য কারণে সৃষ্ট। এই প্রবৃত্তিগুলো মস্তিষ্কের এক বিশেষ অংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর যুক্তিবাদী চিন্তা হয় আর এক অংশের দ্বারা। তাই যুক্তিবাদী চিন্তার সাথে ঐ প্রবৃত্তিলোর কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। একজন যুক্তিবাদী ব্যক্তিরও অন্ধকার রাতে একাকী গোরস্থানে হেঁটে যেতে ভয় করতে পারে। এই ভয় একটা অনুভুতি, কোন যুক্তি দ্বারা আহৃত কোন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নয়। অনুরূপ্পভাবে একজন নাস্তিকেরও জোরাল নৈতিক মূল্যবোধ থাকতে পারে বিবর্তনজাত সহজাত প্রবৃত্তির জন্য, ঐশিক শাস্তির ভয় বা যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে উপনীত সিদ্ধান্তের জন্য নয়। অনেক আস্তিকের মধ্যেও নৈতিক চেতনা দুর্বল হতে পারে সেই বিবর্তনের পারিসাংখ্যিকতার জন্য, যার ফলে কোন কোন মানুষের মধ্য এ সহজাত প্রবৃত্তির মাত্রা কম হয় গড়ের চেয়ে। এই গড় প্রবৃত্তি বিবর্তনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি সমাজের প্রত্যেকেই ১০০% ভাগ সৎ বা ১০০% অসৎ হয়ে যায় তাহলে তা হবে বৈবর্তনিক অস্থিতিশীলতার এক দশা (Evolutionarily Unstable State) . তাই এ দশা বেশীক্ষণ টিকতে পারে না। বিবর্তন মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির এক পারিসাংখ্যিক বন্টন নিশ্চিত করে। এই পারিসাংখ্যিক বন্টনেরও স্থান কাল ভেদে চিছু হেরফের ঘটে। কিন্তু পরিশেষে একটা স্থিতিশীল বন্টনে তা স্থায়িত্ব লাভ করে, অনেকটা পরিসংখ্যানের গড়ে প্রত্যাবর্তনের (Regression to the Mean) এর ধারণার মত ব্যাপারটা। ভাল মন্দের এই অপরিহার্যতা পদার্থবিজ্ঞানের বিধির মধ্যেই অন্তর্নিহিত। এটা বিবর্তনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। মন্দের এই অপরিহার্য্যতা আস্তিকেরাও স্বজ্ঞাতভাবে বোঝেন ও মেনে নেন, যৌক্তকভাবে নয়। তাই মন্দকে তাঁরা ইশ্বরের লীলা খেলা হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেকে বুঝিয়ে আশ্বস্ত করেন। কেউ কেউ সামাজিক ডারউইনবাদ (Social Darwinism) এর পতনের কৃতিত্ব মানবতাবাদের বিজয়ের ওপর আরোপ করেন। কথাটা উপর-উপর অর্থে ঠিক হলেও, আসলে এই পতনটাও বিবর্তনের কারণেই। কারণ আগেই বলেছি বিবর্তন মানবগোষ্ঠিতে সমসত্বতা অনুমোদন করেনা। সামাজিক ডারউইনবাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধূ উন্নত মানের (বা এক বিশেষ শ্রেণীর) মানুষ নিয়ে এক সমাজ গঠন করা, যা বিবর্তন বিরোধী। কোন বিচ্ছিন্ন স্থানে সীমিত সময়ের জন্য সব প্রকার বিসরণ ও অপেরণই (Deviation and Aberration)সম্ভব, কিন্তু গড়ে প্রত্যাবর্তনের দরুন তা চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপী কোন অবস্থা হতে পারেনা। মন্দ ও ভালো উভয়েরই এক পারিসাংখ্যিক মিশ্রণ বৈবর্তনিক অর্থে অপরিহার্য বলে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। অনেকে বলবেন তাহলে মন্দহীন এক আদর্শ সমাজের জন্য আবেগপূর্ণ ইছা, চেষ্টা বা সংগ্রাম করা, এ সবই কি নিস্ফল, অর্থহীন? না, কারণ এই ইচ্ছা বা চেষ্টাও বিবর্তনের সৃষ্ট, কারণ এই ইচ্ছা ও চেষ্টার টানাপোড়েনের দ্বারাই বিবর্তন পারিসাংখ্যিক গড় নিশ্চিত করে। এই ইচ্ছা ও চেষ্টার জন্য নিজেকে বা অপরকে উদ্বুদ্ধ করা এসবই সেই বিবর্তনের কৌশলেরই প্রতিফলন। এ জন্যই ডারউইনবাদীরা, যারা বিবর্তনের এই সত্যকে বোঝেন, তারাও হাত পা গুটিয়ে নেই, তাদের অনেকেও আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে যান। এটা তাদের (সবার নয় অবশ্য, সেই পারিসাংখ্যিক কারণেই) ভেতরের তাড়না,

কিন্তু এই তাড়নাটা যে বিবর্তনের সৃষ্টি এটা বুঝেও এই তাড়নাকে তারা পরাস্ত করতে পারেন না। এটাই বিবর্তনের এক বিচিত্র সত্য।

মানুষের মহান আদর্শ, মনের ভাব ইত্যাদিকে পদার্থবিজ্ঞানেরই ফলশ্রুতি বলায় অনেকে এটা ভাবতে পারেন যে এর দ্বারা মানুষের সুকোমাল দিকের অবমাননা করা হচ্ছে। জীবনকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করায় জীবনের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য তাতে ক্ষুন্ন হচ্ছে। এর উত্তরে ‘‘সত্যই সুন্দর ’’ এই পুরাতন প্রবচনের দ্বিরুক্তি না করে বলব যে যারা বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যার চেষ্টায় লিপ্ত তাদের কেউই কিন্তু এটা মানবেননা। বরং এতে জীবনের এই রহস্যময় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কারণেই জীবন আরও সৌন্দর্যময় মনে হয় বলে তাঁরা মত দেবেন।

সবশেষে বিবর্তনের উপলব্ধির আরেকটি ফলশ্রুতি হল জীবনের পরম কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টার নিষ্ফলতা। ধর্মে বিশ্বাসীরা জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলবেন সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলন ও পরপারের জন্য প্রস্তুতি ইত্যাদি। কেউ এই অর্থ খুঁজে পান পরোপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করে। আবার কেউ জীবনে সর্বোচ্চ আনন্দলাভকেই এর একমাত্র অর্থ মনে করেন। আবার কেউ জ্ঞান অর্জনেই জীবনের সার্থকতা খুজে পান। কিন্তু বিবর্তন বা পদার্থবিজ্ঞানে এই অর্থগুলির কোনটাই নিহিত নেই। বিবর্তন/পদার্থবিজ্ঞানের একটাই উদ্দেশ্য, যদি উদ্দেশ্য বলতেই হয়, সেটা হল বংশাণুকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রেরণ করে তার অমরত্ব নিশ্চিত করা। অবশ্য অনেকেই জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্থ সন্তানসন্ততিতে খুজে পান বটে। কিন্তু চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কেউ বলতে পারেনা। কেন এই নিরন্তর বশাণু সংক্রমণ? কি এর শেষ পরিণতি? পদার্থবিজ্ঞান বা বিবর্তন কেন এই বংশাণু সংরক্ষণের কাজে নিরলস ভাবে নিয়োজিত? যদি বংশাণুর অমরত্ব নিশ্চিত করা ছাড়া আর কোন গূঢ় অর্থ থেকেই থাকে তা আমরা জানিনা। হয়ত পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলিতেই (জানা বা অজানা) এর গূঢ় অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে। কিন্তু কেনই বা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের উৎপত্তি, যার দরুন এই গোটা মহাবিশ্ব তথা বিবর্তনের সৃষ্টি? এই অজানা রহস্যটা অজানাই থেকে যাবে। এই চিরস্থায়ী অজানাই মানুয়ের এগিয়ে যাওয়ার তাড়নী, খুঁড়োর কলের সেই সূতায় ঝুলান লোভনীয় খাবারের মত।